

কমিউনিস্ট ইস্তাহার কি আজও প্রাসঙ্গিক?

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস *কমিউনিস্ট ইস্তাহার* লিখেছিলেন ১৮৪৮ সালে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তখন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান চলেছে। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মার্কস আর এঙ্গেলস এক নতুন রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা বললেন যার নেতৃত্ব দেবে বুর্জোয়াসি নয়, ইউরোপের নব্য শিল্পশ্রমিক শ্রেণী। সেই ডাক পরবর্তী দেড়শো বছর ধরে পৃথিবীর সব দেশে শোনা গিয়েছে। আজও তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও আজকের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মার্কস-এঙ্গেলস-এর সেই বিশ্লেষণ কতটা প্রাসঙ্গিক, তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন তোলা যায়। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশে কমিউনিস্ট তথা বামপন্থী রাজনীতির প্রেক্ষিতে সেরকম কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা অসম্ভব হবে না।

শ্রেণী সংগ্রাম

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে, বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের পর, কমিউনিস্ট রাজনীতি এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখনই *কমিউনিস্ট ইস্তাহার* এবং মার্কস ও এঙ্গেলস-এর অন্যান্য লেখাপত্র ঐসব দেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলে পড়া হতে থাকে। যতদূর জানি, *কমিউনিস্ট ইস্তাহার* বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৯ সালে। *সাধারণ স্বত্বাধিকারীদের ইস্তাহার* নামে সেই পুস্তিকার প্রথম বাক্যটি এইরকম: ‘ইউরোপে এক জুজুর আবির্ভাব হইয়াছে – কমিউনিজমের ভয় এই জুজুর আকার ধারণ করিয়াছে।’ কিন্তু ইস্তাহারের যে বাক্যটি সবচেয়ে অভূতপূর্ব ধারণার আমদানি করল, সেটি হল: ‘অতীত-বর্তমান সব মানবসমাজের ইতিহাস আদতে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।’ এমন কোনো ধারণা এশিয়া-আফ্রিকার দেশে কখনো প্রচলিত ছিল না। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর বিবাদ জানা ছিল। এক রাজ্যের সৈন্যদল অন্য রাজ্য দখল করে নতুন রাজত্ব কায়েম করল, এমন ঘটনাও হত। সময় সময় রাজার বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহ করত। ধনী-দরিদ্রের সংঘাত ছিল। কিন্তু এইসব কলহ-বিবাদের মূলে যে শ্রেণী

সংগ্রাম নামে কোনো সাধারণ নিয়ম থাকতে পারে, এমন কথা কেউ কখনো ভাবেনি। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে শুধু শাসক পরিবর্তন নয়, একটা গোটা সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, এও এক অভিনব ধারণা যার কথা আগে শোনা যায়নি। সুতরাং এশিয়া-আফ্রিকার মানুষকে তাদের দেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করার এক শক্তিশালী প্রকরণ উপহার দিল কমিউনিস্ট ইস্তাহার।

ইস্তাহারের একাধিক বক্তব্য যে তৎকালীন এশিয়া, আফ্রিকা, এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির ক্ষেত্রে খাটে না, তা দেখানো খুব কঠিন নয়। শিল্পশ্রমিক শ্রেণী একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী এবং জনগণের বৃহত্তম অংশ, এ-কথাটা স্বভাবতই ঐসব দেশের বেলায় প্রযোজ্য ছিল না। বিংশ শতাব্দীতেও চিনের বিপ্লব, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ, ইন্দোনেশিয়ার বিশাল কমিউনিস্ট গণসংগঠন যা সেনাবাহিনীর আক্রমণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ, এমনকি সম্প্রতিকালে নেপাল কিংবা ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলের মাওবাদী আন্দোলন – এ সবই আসলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন নয়। শিল্পশ্রমিক শ্রেণী ঐসব দেশের মানুষের অতি ক্ষুদ্র এক অংশ। ইস্তাহারে কিন্তু একাধিক জায়গায় কৃষকের শ্রেণীচেতনার সীমাবদ্ধতা নিয়ে মন্তব্য আছে। তার ফলে আগামী বিপ্লবে কৃষক যে শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্যকারীর ভূমিকা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতে পারবে না, এ-কথা মার্ক্স-এঙ্গেলস বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন। কৃষক যে তার সামান্য ভূসম্পত্তিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, বাজারের নিয়মে তা লাভজনক না হলেও সেটা হাতছাড়া করতে চায় না, এই মনোভাব আমরা বুঝতে পারি, হয়ত তা নিয়ে সহানুভূতিও দেখাই। কিন্তু কৃষকের সেই সমস্ত দাবিকে ভিত্তি করে যে আন্দোলন, মার্ক্স-এঙ্গেলস তাকে পেটি-বুর্জোয়া সোশ্যালিজম, অর্থাৎ খুদে মালিকদের সমাজতন্ত্র বলে ব্যঙ্গ করেছেন। অথচ বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া-আফ্রিকার নানা দেশে কমিউনিস্ট পার্টির কৃষকদের সংগঠিত করে যে সব ব্যাপক আন্দোলন করেছে, তার অধিকাংশই এই খুদে মালিকদের সমাজতন্ত্রের আদর্শে গড়া। তারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই চেয়েছে, ছোট চাষিকে নানা ভাবে সাহায্য করে তার নিজের জমিতে টিকিয়ে রাখতে। তাই মনে হয়, নিজেদের ঐতিহাসিক প্রয়োজন অনুযায়ী আন্দোলনের রূপরেখা স্থির করার সময় ঐসব দেশের কমিউনিস্ট নেতারা ইস্তাহারের ঐ অসুবিধাজনক অংশগুলি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।

এই বিষয়টা বেশ ভালো বোঝা যায় কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে বাংলায় লেখা গোড়ার দিকের লেখাপত্রের দিকে তাকালে। শিপ্রা সরকার ও অনমিত্র দাশ সম্পাদিত ‘বাঙ্গালির সাম্যবাদ চর্চা’ নামে একটি মূল্যবান সংকলন আছে। তাতে দেখছি, ১৯২৩ সালে ‘সাম্যবাদী’ পত্রিকায় শ্রেণীসংগ্রামকে বড়লোক আর ছোটলোকের লড়াই-এর ভাষায় বর্ণনা করা হচ্ছে:

আমরা জাগিব, জাগিয়া বুঝিব আমরা কিসে ছোট। সাম্যবাদী আমাদের পথ দেখাইতে আসিয়াছে। তাই সাম্যবাদীকে আমরা সালাম করি। আমরা উচ্চ লেখাপড়া শিখিব, ধর্মের তত্ত্ব জানিব। তবু চাষ করিব, তাঁত বুনিব, মাছ বেচিব, ঘানিতে সরিষা মাড়াইব। তাহাতে কি যে অপরাধ হয়, তাহা না জানিয়া কিন্তু ছোট আর থাকিব না। এসো ভাই সব যাহারা ছোট নাম পাইয়া সমাজের এক কোণে পড়িয়া আছ, লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়া আছ। আমাদের সরদার আসিয়াছে, আমাদের নেতা আসিয়াছে, আমাদের ভাই আসিয়াছে। আসিয়া আমাদের আদিগকে ডাক দিয়াছে। এসো দেখি ভাই, আমরা ছোট কোনখানে? এসো আজ দেখিব সমাজের প্রাণ হইয়াও সমাজে কেন আমাদের জায়গা হয় না। খোদার ডাক, রসুলের ডাক, ভাইয়ের ডাক আসিয়াছে। এসো ভাই, ওঠো ভাই, আমরা জাগিব।

১৯২৬ সালে মুজফফর আহমেদ তাঁর নিজের সম্পাদিত “লাঙ্গল” পত্রিকায় ভারতের কৃষককে শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত বলেই বর্ণনা করছেন।

যদি তার আয়ের বেশির ভাগই সে দিন-মজুরি বা চাকরির মাইনের দ্বারা পায় তো সে শ্রমিক। শ্রমিকের অস্তিত্বটা বজায় থাকে তার বাছুর বা মস্তিষ্কের শক্তির বিক্রয়ের দ্বারা। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকও শ্রমিকের শ্রেণীতে এসে পড়েছে। তার উৎপন্ন দ্রব্য এমনভাবে বিলুপ্তিত হয় যে তাকে ক্ষেতের মজুর ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

তারপর দেখছি, মুজফফর আহমেদ সম্পাদিত ‘গণবাণী’ পত্রিকায় ১৯৩২ সালে ‘শ্রেণীসংগ্রাম’ নামে এক প্রবন্ধে লেখা হচ্ছে:

সে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্বের কথা, কার্ল মার্কস ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে। ... মানবসমাজ যতই উন্নত

হইতে থাকে উৎপাদনের প্রণালীও ততই উন্নততর হয় এবং শ্রেণীসকল নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে ততই সচেতন হয়। তার ফলে শ্রেণীগত বিরোধ দিন দিন প্রবলাকার ধারণ করে। পাশ্চাত্যে এই সংগ্রাম যেরূপ ভীষণভাবে বর্তমান, ভারতে যে অবস্থা ততটা গুরুতর নহে, ইহার কারণ এরূপ মনে করা ভুল যে - ভারত আধ্যাত্মিক দেশ, তাই এখানে এ বালাই নাই। ইহার প্রকৃত কারণ - ভারতের সমাজ আরও অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। দ্রব্যোৎপাদনের আধুনিক যন্ত্রসমূহ এখানে ততটা উন্নতি ও প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। তাই পাশ্চাত্যের ন্যায় এখানে শ্রেণীসংগ্রামও ততটা পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। ... ভারতেও যে যে স্থানে কল-কারখানার প্রাচুর্য আছে, সেখানে মালিক ও মজুরদের মধ্যে বিরোধ পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা বড় কম নহে। তবে একথা সত্য যে ভারতের মজুরদের আত্মসংবিৎ আজও ততটা জাগ্রত হয় নাই।

অর্থাৎ ইউরোপের সঙ্গে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার তফাত এই নয় যে এক ক্ষেত্রে শ্রেণীভেদ আর শ্রেণীসংগ্রাম আছে, অন্য ক্ষেত্রে নেই। তফাত শুধু সমাজবিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্যায়ে। ইউরোপে পুঁজিবাদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত, পুঁজির মালিকের কারখানায় শিল্পোৎপাদন সেই সমাজের প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা, দেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী সেইসব কারখানার মজুরি পাওয়া শিল্পশ্রমিক। ভারতে পুঁজিবাদের শৈশব অবস্থা। শ্রমজীবীর সিংহভাগ এখানে কৃষক, যাদের শোষণ করে জমিদার আর মহাজন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাই কৃষকশ্রেণীর এক বিশিষ্ট, হয়তো বা প্রধান ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। এইভাবে শ্রেণীসংগ্রামের মূল ছকটি বজায় রেখে সমাজবিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্যায় অনুসারে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের একটি প্রধান বক্তব্যের প্রয়োজনীয় রূপান্তর ঘটানো হল।

তা সত্ত্বেও কিন্তু কৃষকের বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্বন্ধে এদেশের কমিউনিস্টদের বারে বারে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করার প্রয়োজন হয়েছে। ১৯৩৯ সালে যেমন 'অগ্রণী' পত্রিকায় অনন্ত মুখার্জি লিখছেন: 'মার্কস-এঙ্গেলস কখনওই এই সিদ্ধান্ত করেন নাই যে, - ধনবাদী (বুর্জোয়া) বিপ্লবেই কৃষক শ্রেণী তাহার সমস্ত বৈপ্লবিক শক্তি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে এবং আর কখনও সে বৈপ্লবিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে না বা সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীর সহায়করূপে অগ্রসর হইবে না।' কৃষক আর শ্রমিকের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত নেই, আছে স্বার্থের ঐক্য।

আজ অবশ্য প্রশ্ন করা যেতে পারে, ভারতে তো পুঁজির প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। জমিদার শ্রেণীর তুলনায় পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে। অথচ শিল্পশ্রমিক শ্রেণী সংখ্যার দিক দিয়ে আজও নগণ্য। ভারতের অধিকাংশ শ্রমজীবী হয় কৃষক, না হয় তথাকথিত অসংগঠিত ক্ষেত্রে নানা উপায়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে চলেছে। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে পুঁজির অবশ্যস্তাবী অগ্রগতির যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সর্বত্র চিনের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে সারা বিশ্বে নিজেকে স্বমূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করার গল্প শোনানো হয়েছিল, সেই কাহিনী কিন্তু বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে মেলেনি। আজ অনেকে বলছেন, পুঁজির অধীন যে সংগঠিত শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্র, মালিক-শ্রমিকসহ তা আজ সামগ্রিকভাবে বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিপরীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক আর অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বা কৃষকের স্বার্থের কোনো মিল নেই।

উপনিবেশ

যে সংগঠনের পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট ইস্তাহার লেখা হয়েছিল, সেই কমিউনিস্ট লিগ ছিল পুরোপুরি ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন। ইউরোপের বাইরের কোনো দেশের প্রতিনিধি সেখানে ছিল না। তারপর আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ নামে যে সংগঠন তৈরি হয়, যাকে অনেকসময় প্রথম ইন্টারন্যাশনাল বলা হয়ে থাকে, সেখানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ছাড়া ইউরোপের বাইরের কোনো প্রতিনিধি ছিল না। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা আর উরুগুয়ের প্রতিনিধি ছিল, বাকি সব ইউরোপের। রুশ বিপ্লবের পর তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালেই প্রথম এশিয়া-আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে চর্চা শুরু হয়, সেসব দেশের প্রতিনিধিরা সেই আলোচনায় সক্রিয় অংশ নেন। সুতরাং কমিউনিস্ট ইস্তাহার যখন লেখা হয়, তখন তা একটি ইউরোপিয়ান সংগঠনের তরফ থেকে ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণীর বক্তব্য হিসেবে ইউরোপের রাজনৈতিক মহল ও বৃহত্তর জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। বিশ্বের অন্যত্র শোষিত মানুষের রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার প্রসঙ্গ ইস্তাহার-লেখকদের চিন্তার মধ্যে ছিল না।

তা সত্ত্বেও উপনিবেশের কথা ইস্তাহারে বার কয়েক এসেছে। যে বিষয়গুলি নিয়ে স্পষ্ট মন্তব্য আছে, সেগুলি হল: আমেরিকায় ইউরোপিয়ানদের বসতি স্থাপন, ভারত আর চিনের বাজারে ইউরোপিয়ানদের অনুপ্রবেশ, এবং ঔপনিবেশিক বাণিজ্য, যার বৈপ্লবিক প্রভাবে ইউরোপের ক্ষয়িষ্ণু

সামন্ততন্ত্রের পতন আরও ত্বরান্বিত হল। এই সাম্রাজ্য স্থাপন ও বৃদ্ধির ইতিহাস যে ব্যাপক হিংসা আর লুণ্ঠনের ইতিহাস, যার ফলে সেই সব দেশের সমাজব্যবস্থার অবর্ণনীয় ক্ষতি হয় – কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে পড়ে – সেকথা ইস্তাহারে বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণী বাণিজ্যবৃদ্ধির লোভে কেমন ভাবে অসভ্য জাতিদের বিদেশীবিদ্বেষের বেড়া ভেঙ্গে তাদের জোর করে সভ্য জগতের সঙ্গে লেনদেনে বাধ্য করেছে। ইস্তাহারের ভাষা থেকে স্পষ্ট, এই প্রক্রিয়া নির্মূলের হলেও তা মানবসমাজের প্রগতির জন্য জরুরি ছিল।

ইস্তাহার লেখার কিছুদিন পর থেকে মার্কস যখন লন্ডনে বাস করতে শুরু করলেন, তখন তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, বিশেষ করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল হলেন। ১৮৫০-এর বছরগুলোতে ‘নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন’ পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। সেসময় ভারতবর্ষ নিয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলোতে একদিকে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনস্পৃহা আর হিংসার মর্মান্তিক বিবরণ আছে, তেমনি আবার সেই আক্রমণের সামনে পড়ে ভারতবাসীর প্রতিরোধ আর বিদ্রোহের বর্ণনাও আছে। কিন্তু অন্যদিকে সেই ভয়াবহ ঘটনাবলি যে স্থবির প্রাচ্যসমাজকে তার স্বাভাবিক অনড় অবস্থা কাটিয়ে সচল হতে বাধ্য করেছে, সে কথাও মার্কস লিখতে ভোলেননি। তাই বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইউরোপিয়ানদের সাম্রাজ্যবিস্তার একদিকে যেমন অত্যাচার আর হিংসার কাহিনী, অন্যদিকে তা ঐতিহাসিক প্রগতির প্রস্তুতিপর্বও বটে। জীবনের শেষ বছরগুলোতে অবশ্য মার্কস তাঁর এই মত অনেকটা বদলেছিলেন বলে মনে হয়। এই সময় ভারতবর্ষ আর বিশেষ করে রাশিয়া নিয়ে তাঁর পড়াশোনা আর চিন্তাভাবনার যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় তিনি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইতিহাস ঠিক ইউরোপের ছক মেনে উন্মোচিত নাও হতে পারে। অর্থাৎ মানবসমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের যে ছক ইস্তাহারে বর্ণিত আছে, তা সব দেশে দেখা নাও যেতে পারে। কিন্তু কমিউনিস্ট ইস্তাহারের ক্ষেত্রে অন্তত নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তা একান্তই ইউরোপ-কেন্দ্রিক রচনা। বিশ্বের অন্যান্য দেশে তা যথেষ্ট প্রভাব ফেললেও তার সব সিদ্ধান্ত সর্বত্র প্রযোজ্য ছিল না। বহু ক্ষেত্রেই তার প্রয়োজনমতো রদবদল করে নিতে হয়েছিল।

আর একটা বিষয় নিয়ে সম্প্রতিকালের গবেষকেরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উপনিবেশ কেবল ইউরোপিয়ানদের বসতিস্থাপন, বাণিজ্য অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করার ক্ষেত্র ছিল না। সেসব দেশের ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীজগৎ, সামাজিক প্রথা, রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি সবরকম বিষয় নিয়ে ইউরোপিয়ানরা এক বিশাল জ্ঞানভান্ডার সৃষ্টি করে, যাতে ঔপনিবেশিক শাসনক্ষমতা আর ঔপনিবেশিক জ্ঞান এক জায়গায় মিশে যায়। এডওয়ার্ড স্ট্রুদ-এর ‘ওরিয়েন্টালিজম’ গ্রন্থের আদলে গবেষণা করে অনেকেই দেখিয়েছেন, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের একাধিক বিষয়, যেমন উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, আবহাওয়াবিজ্ঞান ইত্যাদি, তাদের উদ্ভবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা। ভারতবর্ষে যেমন এইসব বিষয়ে চর্চার জন্য পৃথক পৃথক সার্ভে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল, যেমন জিওলজিক্যাল সার্ভে, বোটানিক্যাল সার্ভে ইত্যাদি। নৃতত্ত্ব আর জনসংখ্যাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিংশ শতাব্দিতে সংখ্যাতত্ত্ব শিক্ষা আর প্রয়োগের প্রধান স্থান হয়ে ওঠে ভারত। তেমনি আবার মিশর আর ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান এবং সংগ্রহশালা প্রত্নতত্ত্ব চর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৮৪৮ সালে মার্কস-এঙ্গেলস-এর পক্ষে ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদের এই বহুবিস্তৃত প্রভাব অনুমান করা সম্ভব ছিল না। বরং নানা দিক দিয়ে তাঁরা তাঁদের সমকালীন ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান জগতের ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণার মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন।

ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে উপনিবেশের ভূমিকার কিছু কিছু দিক মার্কস-এঙ্গেলস-এর লেখায় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অনেক কিছুই হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প-পুঁজিবাদের উত্থান মার্কসের জীবৎকালে ততটা স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি। তাই সেখানকার আদি অধিবাসীদের হত্যা করে কিংবা বাস্তবচ্যুত করে এক বিশাল মহাদেশের সমগ্র ভূখণ্ড যে ইউরোপিয়ান অধিবাসীরা দখল করে নিল, তার কথা মার্কস-এঙ্গেলস লেখেননি। যেমন লেখেননি আমেরিকায় বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদনে আফ্রিকা থেকে আনা ক্রীতদাসদের ভূমিকার কথা। বিংশ শতাব্দিতে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-পুঁজিবাদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল, তখন তার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সেসব আলোচনা কমিউনিস্ট ইস্তাহারে থাকা সম্ভব ছিল না।

আরও একটা বিষয় শুধু ইস্তাহারে নয়, মার্কস-এর কোনো লেখাতেই আলোচিত হয়নি। ইউরোপে পুঁজির প্রাথমিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল কৃষি এবং হস্তশিল্পে নিযুক্ত মানুষদের তাদের জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে শ্রমবিক্রেতা মজুরে পরিণত করা। তাঁর ‘পুঁজি’ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে ‘প্রিমিটিভ অ্যাকুমুলেশন’ নামক অংশে মার্কস দেখিয়েছেন যে, প্রাথমিক উৎপাদক, অর্থাৎ কৃষক আর কারিগরদের তাদের উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিযুক্ত করতে পারলে তবেই সেই উপকরণ, মূলত জমি আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি, পুঁজির দখলে আসে। সেই সঙ্গে বিরাট সংখ্যক মানুষ জীবিকাহীন হয়ে পড়ায় শহরের কলকারখানায় এসে মজুর হিসেবে শ্রম বিক্রি ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকে না। ফলে পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদনের দুটি আবশ্যিক শর্ত – জমি আর মজুর – দুটিই পূরণ হয়। মার্কস কিন্তু ধরে নিয়েছিলেন, গ্রামাঞ্চলের কৃষি আর হস্তশিল্প থেকে যত লোক উৎখাত হবে, তারা সবাই শহরের কলকারখানায় কাজ পাবে। তা কিন্তু হয়নি। এই বাড়তি জনসংখ্যা তাহলে কোথায় গেল? ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ঊনবিংশ শতাব্দিতে ইউরোপ থেকে ছয় কোটি মানুষ আমেরিকা চলে গিয়েছিল। তার ওপর ছিল ইউরোপের অন্তহীন যুদ্ধবিগ্রহ যাতে শুধু উনিশ শতকে কম করে এক কোটি লোক মারা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা যায় দু কোটি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু ইউরোপে মারা যায় পাঁচ কোটি মানুষ। কোনো সন্দেহ নেই, মৃতদের অধিকাংশ ছিল গ্রামাঞ্চলের কৃষক পরিবারের সন্তান। এছাড়া উনিশ শতকের ইউরোপে দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে খুব কম লোক মারা যায়নি। সে সময়কার রাজনৈতিক অবস্থায় যুদ্ধ কিংবা মহামারীতে উদ্ধৃত দরিদ্র মানুষদের গণমৃত্যু রাজ্যশাসকদের গদি টলাত না। তাই অভিবাসনের গন্তব্যস্থান আর প্রতিযোগী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের কারণ হিসেবে উপনিবেশ কিন্তু ইউরোপে প্রাথমিক শিল্প-পুঁজি সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। তার সব দিক শুধু কমিউনিস্ট ইস্তাহারে নয়, মার্কস বা এঙ্গেলস-এর অন্যান্য রচনাতেও আলোচিত হয়নি।

জাতীয়তা

ইস্তাহারে একটি বাক্য আছে: ‘শ্রমিকের কোনো দেশ নেই।’ কোনো কোনো অনুবাদে মূল জার্মান শব্দের অর্থ বজায় রেখে লেখা হয়: ‘শ্রমিকের কোনো পিতৃভূমি নেই।’ মার্কস-এঙ্গেলস-এর বক্তব্য ছিল যে, তৎকালীন ইয়োরোপে সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক জাতি-রাষ্ট্র

নির্মাণের যে ঢেউ বয়ে চলেছিল, তা একান্তই বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। যেহেতু তা গণতান্ত্রিক, সে জন্য শ্রমিক শ্রেণী সেই আন্দোলনে অংশ নিয়ে নতুন জাতি-রাষ্ট্রে তার গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেছে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব রাজনীতি কখনোই জাতি-রাষ্ট্রের সীমানার ভেতর আবদ্ধ থাকতে পারে না। কারণ পুঁজির জাল যেমন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, নানা দেশের শ্রমিক আন্দোলন তেমনি একে অপরের সহযোগী হিসেবে এক বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে চলেছে। তাই এক দেশের শাসক শ্রেণী যখন সাম্রাজ্যবিস্তারের লোভে কিংবা ব্যবসার স্বার্থে অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন সে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর কিন্তু কোনো দায় নেই সেই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার। শ্রমিকের কোনো দেশ নেই।

ইস্তাহারের এই বাক্যটি নিয়ে কিন্তু পরবর্তী কালে বহু টানাপোড়েন চলেছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সোশ্যাল-ডেমোক্রেট দলের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী যথেষ্ট সংঘবদ্ধ ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সাহায্যে দেশে দেশে শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা যত এগিয়ে এল, ততই দেখা গেল যে আন্তর্জাতিকতা ভুলে এক এক দেশের শ্রমিক সংগঠন তার নিজের রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বযুদ্ধে উভয় পক্ষে যত সৈন্য প্রাণ দিয়েছিল, তার একটা বড় অংশ ছিল শ্রমিক। ‘শ্রমিকের কোনো দেশ নেই’, এই সরল ফর্মুলা দিয়ে জাতীয়তাবাদের সম্মোহনী শক্তিকে প্রতিহত করা যায়নি।

আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনেও এই বিষয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এদেশের কোন কোন শ্রেণীর স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে আর কারা সাম্রাজ্যবাদের অবসান চায়, তাই নিয়ে অনেক চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে। ১৯৩২ সালে ‘গণবাণী’-তে যেমন লেখা হয়েছিল:

জায়গিরদারদের দাসত্ব বন্ধন হইতে সমাজের উৎপাদনকারীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য বুর্জোয়া ও জায়গিরদারদের মধ্যে যে ঐতিহাসিক সংঘর্ষ চলিয়াছিল, বর্তমান জাতীয় আন্দোলন পূর্বেকার ওই আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। ... সম্ভ্রান্ত জমিদার সম্প্রদায় দেশের

এই জাতীয় আন্দোলনের বিপক্ষে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে জাতীয় আন্দোলন শুধু ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন নহে, জায়গিরদারি প্রথারও বিরুদ্ধে।

অর্থাৎ এই যুক্তিতে শ্রমিক-কৃষক উভয়েরই জাতীয় আন্দোলনের শরিক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অন্য সময় আবার অনেক কমিউনিস্ট মনে করেছেন, জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে বড় বড় জমির মালিকদের একটা বোঝাপড়া আছে যার মাধ্যমে ব্রিটিশরা চলে গেলে তারা দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে পারে। অন্যদিকে আবার এমন মতও ছিল যে, ভারতের বড় ব্যবসায়ী আর বড় জমির মালিক, সকলেই সাম্রাজ্যবাদের ক্রীতদাস। সুতরাং জাতীয়তার প্রশ্নে শ্রমিকের অবস্থান নিয়ে ইস্তাহারের স্লোগান এদেশে অন্তত খুব একটা সাড়া ফেলতে পেরেছিল বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে ব্রিটিশ, ফরাসি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ ইত্যাদি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। বিশ্বের সর্বত্র আধুনিক শাসনব্যবস্থার মান্য রূপ হিসেবে জাতি-রাষ্ট্রকেই সকলে গ্রহণ করে নেয়। সোভিয়েত রাশিয়া আর তার কক্ষাধীন দেশগুলোতে এবং চিনে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিও এক বিশ্বজনীন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অর্জন করে। ১৯৮০-র দশক থেকে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক উন্নতির ফলে অর্থলগ্নি পুঁজি এবং শিল্পোৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পৃথিবীজোড়া পরিবর্তন দেখা যায়, সংক্ষেপে যার নাম বিশ্বায়ন। এর ফলে বাণিজ্যিক শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের বড় বড় কারখানাগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর পশ্চিম ইউরোপের দেশ থেকে দক্ষিণ আমেরিকা আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থানান্তরিত হতে থাকে। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এই প্রবণতা বহুগুণ ত্বরান্বিত হয়। সবচেয়ে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে চিনে। কমিউনিস্ট পার্টির একক শাসনে এবং সজাগ তত্ত্বাবধানে সে দেশে পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদন ও ভোগ্যপণ্য বেচাকেনার এক বিশাল বাজার খুলে যায়, যার ফলে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক আমূল বিবর্তন ঘটে। আজ যদি বিশ্বপুঁজির চেহারা বর্ণনা করতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে তার তিনটি ভরকেন্দ্র আছে। তার একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত, দ্বিতীয়টি ইউরোপে, তৃতীয়টি চিনে। তিনটি কেন্দ্র অর্থলগ্নি আর বাণিজ্যিক বিনিময়ের নানা জটিল সম্পর্কের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু স্বার্থের সংঘাতও আছে

প্রচুর। বিশ্বপুঁজির এই কাঠামো বলা বাহুল্য দেড়শো বছরেরও বেশি দিন আগে মার্কস-এঙ্গেলস-এর পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদনের যে প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব মারফত ইউরোপে সমাজতন্ত্রের যুগ আসন্ন, সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজও বহাল রয়েছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইউরোপে ঘটেনি, ঘটেছে অনুন্নত ও কৃষিপ্রধান রাশিয়ায় আর চিনে। সেই সমাজতন্ত্রও আজ লুপ্ত।

সুতরাং একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল ছাড়া কমিউনিস্ট ইস্তাহারের আজ আর কোনো মূল্য আছে কি? উত্তরে বলা যেতে পারে, ঐতিহাসিক গুরুত্বটা কিন্তু কম নয়। বিশ্ব-ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে ধনতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী প্রসার আর তার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল প্রতিরোধের বদলে বৈপ্লবিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে লেখা মার্কস আর এঙ্গেলস-এর এই পুস্তিকাটি উনিশ-বিশ শতকের নানা ঘটনা বুঝতে আমাদের আজও সাহায্য করে। ইস্তাহার তার সমসাময়িক রাজনৈতিক বাদানুবাদে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। তার ভেতর যদি আমরা দৈববাণী খুঁজতে যাই, তাহলে ভুলটা আমাদেরই, ইস্তাহার-লেখকদের নয়।